দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ...23 AUG 2016...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ড. তোফায়েল আহমেদ

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপর নজরদারি

নজরদারির প্রশ্ন যখন আসছে তখন শুধু জঙ্গি কর্মকাণ্ড নয়, বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থার সার্বিক উৎকর্ষতার জন্যই নজরদারি, নির্দেশনা, পরামর্শ ও আইনগত পদক্ষেপ প্রয়োজন। আইন ভঙ্গকারীও নির্দিষ্টমান অর্জনে ব্যর্থ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরই সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের নজরদারি প্রয়োজন। স্বল্পায়ু এ জঙ্গি তৎপরতা একদিন শেষ হয়ে যাবে কিন্তু উচ্চশিক্ষার গুণ ও মান অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও নজরদারি অব্যাহত রাখতে হবে

হলি আর্টিজান বেকারি এবং শোলাকিয়ার ঈদ-জামাতের দু'টি অপ্রত্যাশিত ও অভাবিতপূর্ব ঘটনায় পুরো দেশ, জাতি বিস্মিত-হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। সারাদেশ, জাতি এ জাতীয় ঘটনায় সরকার ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর পাশে থাকার অঙ্গীকার করে। সারাবিশ্ব বাংলাদেশের এ ঘটনায় সরকারকে সমর্থন ও সহযোগিতার আশ্বাস দেয়। গুলশান ট্রাজেডির প্রায় দেড় মাস গত হলো। এখন সর্বত্র সবাই নিজেদেরকে গুছিয়ে নিচ্ছেন। আমাদের পুলিশ, র‍্যাব এবং গোয়েন্দা বাহিনী এরকম ঘটনার জন্য পূর্ব থেকে পুরোপুরি প্রস্তুত ছিল জোরদিয়ে বলা যায় না। ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর তারা তাদের কর্মকৌশলকে নতুনভাবে সাজাচ্ছেন। দুনিয়ার যেখানে এ জাতীয় ঘটনা ঘটেছে সর্বত্রই একই অবস্থা। এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের বিষয় উল্লেখ করা যায়। তাদের সুদক্ষ পুলিশবাহিনীতে এক্ষেত্রে সক্ষমতার পরিচয় দিতে পারেনি। এ অবস্থাটি অস্বাভাবিক নয়। শত্রু যখন চিহ্নিত ও মুখোমুখি তখন তার মোকাবিলা যত সহজ, এরকম অদৃশ্য আচমকা নিতান্ত ব্যক্তির বিকৃতিকে পূর্ব প্রস্তুতিতে মোকাবিলা সহজ নয়।

গুলশান ও শোলাকিয়ার ঘটনার পর জাতিগতভাবে দেশের সকল মানুষ এবং রাষ্ট্রের পরিচালক হিসাবে সরকার ঘটনার কারণ বিস্তৃতি এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে নানারকমের অনুসন্ধান ও আত্মজিজ্ঞাসার মুখোমুখি। এ দু'টি ঘটনায় যাদের জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে, তাতেও সর্বসাধারণের প্রচলিত বিশ্বাসের ভিত নড়বড়ে হয়ে পড়ে। খেলোয়াড়, সংগীত পছন্দ তরুণ ইংরেজি মাধ্যমে লেখাপড়া করা সচ্ছল-উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান বিশেষত দু'একটি স্বনামধন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সম্পৃক্তি পাওয়া যায়। সাধারণত মনে করা হতো হতদরিদ্র পারিবারিক পটভূমি থেকে আসা ইহজাগতিক শিক্ষা থেকে দূরে থাকা মাদ্রাসার ছাত্ররাই এসব জঙ্গি কাজে জড়িত হবার ব্যাপারটি ছিল স্বাভাবিক। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সচ্ছল পরিবারের সন্তানের সম্পৃক্ততার বিষয়টি ছিল সাধারণের কল্পনার বাইরে।

এসব ব্যাপারে ব্যাপক আত্ম-অনুসন্ধান ও আত্ম-জিজ্ঞাসার পর অনেক রকমের পদক্ষেপের বিষয় আলোচিত হচ্ছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপর বিভিন্ন রকমের নজরদারি। যার মধ্যে কেউ বলছেন—ছাত্র সংগঠন করার কথা, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বলেছে 'পর্যবেক্ষক' দেয়ার কথা। ইসলামিক ফাউন্ডেশন দেশের তিন লাখ মসজিদে অভিন্ন খুতবা দেয়ার বিষয়ে সোচ্চার হলো। শিক্ষামন্ত্রী মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী বলে কথিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের ঘোষণা দিচ্ছেন। তাছাড়া সারাদেশে পুলিশের তৎপরতা অনেক বেড়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে নজরদারি বিষয়ে দু'একটি কথা বলাই এ রচনার প্রধান উদ্দেশ্য। আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষা বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সরকারি ও বেসরকারি কেউই খুব একটা ভাল অবস্থায় নেই। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা এক রকম এবং বেসরকারিগুলোর সমস্যা ভিন্ন রকম। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়-গুলোতে সুশাসনের সমস্যা প্রকট। কাজ-অকাজ-কোনোটির জবাবদিহিতার কোনো ব্যবস্থা নেই। প্রধান প্রধান পদ উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ এবং বিভিন্ন কমিটিসমূহ রাজনৈতিক দলীয় পরিচয়ে হয়। তাই প্রধান নির্বাহীরা কোনো কিছুই নির্বাহ করতে পারে না। ছাত্র-রাজনীতি, শিক্ষক-রাজনীতি, কর্মকর্তা-কর্মচারীর রাজনীতি, জাতীয় ও স্থানীয় রাজনীতি ক্রীড়নক হিসাবে তাদের কাজ করতে হয়। এক্ষেত্রে পাঠদান, পাঠগ্রহণ, গবেষণা, সৃজনশীলতা, স্বাভাবিক সভ্য-সংস্কৃত আচরণ সবকিছুতেই একধরনের নৈরাজ্যের রাজত্ব। ১৯৭৩ সালের অর্ডিন্যান্স বলে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বর্তমানে আসলে রাষ্ট্রের ভিতরে ভিন্ন প্রকৃতির রাষ্ট্র। এখানে কেউ কারো কাছে জবাবদিহি করে না। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের ইতিহাসে গত আড়াই/তিন দশকের সংযোজন। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সবগুলো যেমন একই রকমভাবে বিচার করা যায় না। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও পড়াশুনার মান, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত, সময়মত শিক্ষাবর্ষ সমাপন, ক্লাস ও পরীক্ষার শৃঙ্খলা একরকম নয়। জঙ্গি ঘটনার সবচেয়ে বেশি কটাক্ষের শিকার হলেও নর্থ সাউথ এবং আইইউবি ব্র্যাকসহ দেশের প্রথমসারির ৮/১০টি বিশ্ববিদ্যালয় পাঠদানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ভালো করছে বলে আমার ধারণা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর নজরদারি প্রশ্ন যখন আসছে সেটি শুধুমাত্র জঙ্গি তৎপরতা বিষয়ে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত হবে না। জঙ্গিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের কতজন ছাত্র-শিক্ষকই বা জড়িত হতে পারে? এ সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। জঙ্গিবাদী তৎপরতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র-শিক্ষক যুক্ত হয়েছে কিন্তু এটিই পুরো বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থা নয়। বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থা আরো বহুবিধ রোগে আক্রান্ত। জঙ্গি তৎপরতায় সম্পৃক্ততা একটি বিশেষ রোগের উপসর্গ, প্রধান রোগ নয়। তাই সুচিন্তিতভাবে মূল রোগের চিকিৎসা করলে কান টানলে মাথা আসার মত এটিও আসবে।

বিশ্ববিদ্যালয় অন্য যেকোনো প্রতিষ্ঠান থেকে ভিন্ন। এখানে ছাত্র-ছাত্রী হিসাবে যারা ভর্তি হয় তাদের বেশির ভাগই বয়সের একটি বিশেষ সন্ধিক্ষণে ঘরের চার দেয়ালের বাইরে একটি বৃহত্তর সমাজে প্রবেশ করে। এ সময় তারা অবাধ স্বাধীনতা চায়। বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থা সে স্বাধীনতা নিশ্চিত করে। শিক্ষকতা পেশা অন্যান্য চাকরি ও পেশার চেয়ে ভিন্ন। এখানে একজন শিক্ষক স্বাধীনভাবে তার নিজস্ব একটি ব্যক্তিত্ব, মতাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বেড়ে উঠতে পারে। সে মতাদর্শ বেশিরভাগের পছন্দ না হলেও তা

ধারণ করার অধিকার এ ব্যবস্থায় স্বীকৃত। তাই বলে ছাত্র-শিক্ষক কেউই কোনো ফৌজদারী অপরাধের সঙ্গে জড়িত হতে পারে না। তা দেশের প্রচলিত আইনে অবশ্যই বিচার্য। তাই নজরদারির ক্ষেত্রে যে প্রশ্নটি মনে রাখা প্রয়োজন তা হচ্ছে, অতি নজরদারির যেন অপব্যবহার না হয়। কেউ এ নজরদারির সুযোগে ব্যক্তিগত, পেশাগত ও রাজনৈতিক বিরোধী নির্মূলে যেন এ অস্বাভাবিক অবস্থার সুযোগ না নেয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জঙ্গিবাদ একটি ক্ষয়িষ্ণু শক্তি। জঙ্গিবাদের মাধ্যমে মহৎ কিছু অর্জনের কোনো সম্ভাবনা নেই। আন্তর্জাতিকভাবে আইএস-আইএল-আল-কায়েদাসহ অন্যান্য সকল গোষ্ঠি এখন কোণঠাসা। দিনদিন তাদের শক্তি দ্রুত ক্ষয় হচ্ছে। বাংলাদেশেও এ শক্তির কোনো ভবিষ্যৎ নেই। বিশ্বের ইতিহাসে এমনকি উপমহাদেশ এবং বাংলাদেশ ভূখণ্ডেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গোষ্ঠি রাজনৈতিক আদর্শ বাস্তবায়নে অস্ত্র হাতে নিয়েছিল। কিন্তু সেসব ক্ষণস্থায়ী আন্দোলন স্বল্প সময়ের মধ্যেই তাদের মোহভঙ্গ ঘটিয়েছে। একসময় পশ্চিমবঙ্গে নকশাল বাড়ি আন্দোলন প্রচুর মেধাবী তরুণদের আকৃষ্ট করেছিল। বাংলাদেশে অনেক বামপন্থি নেতা বিচ্ছিন্নভাবে সমগ্র বিপ্লবের লক্ষ্যে প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তাদের ঐ মতাদর্শ ছিল অত্যন্ত স্বল্পায়ু। ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে বিভিন্ন ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হিসাবেও কিছু সামাজিক বিচ্যুতি, বিকৃতি ও বৈকল্য ঘটে থাকে। এসব কখনও স্থায়ী হয়নি। রাজনীতি ও সমাজ পরিবর্তনের উদ্যোগ-আন্দোলনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠিন সত্য হচ্ছে, সন্ত্রাসী তৎপরতার মাধ্যমে রাজনৈতিক পরিবর্তন কোথাও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। সাংবিধানিক ও নিয়মতান্ত্রিক পথই একমাত্র দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তনের পথ। তাই বর্তমানে জঙ্গিবাদ নিয়ে আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রে যে উদ্বিগ্নতা তা যথোপযুক্ত। কিন্তু এক্ষেত্রে 'জঙ্গিপনা' দিয়ে জঙ্গিবাদ থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা দীর্ঘমেয়াদে ভাল ফলাফল দিবে না। এখানে পুলিশি কার্যক্রমে দক্ষতা ও গতিশীলতা প্রয়োজন। অন্যান্য সকল রাষ্ট্রিয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রয়োজন সর্বোচ্চ সুশাসন ও ন্যায়পরায়ণতা। পুলিশের কাজ পুলিশ করবে আইনানুগ পন্থায় অত্যন্ত সতর্কতা ও সর্বোচ্চ দক্ষতার সঙ্গে। আর বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের চরিত্র বজায় রেখে পাঠদান, পাঠ গ্রহণ, গবেষণা মুক্তচিন্তার বিকাশে যা যা করার তা করবে। চিন্তা ও মতাদর্শকে শক্তি দিয়ে নয়, প্রতিচিন্তা ও শুদ্ধ মতাদর্শের মাধ্যমে মোকাবিলা করতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এ কাজটি করার উপযুক্ত ক্ষেত্র।

আমরা আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের মূল আদর্শকে সঠিকভাবে ধারণ করতে পারিনি। আমরা নিতান্তই অনুদার ও অসহিষ্ণুতার সঙ্গে গণতন্ত্র চর্চা করতে চাই। ফলে গণতন্ত্র চর্চার যে বহিরাবরণ বিশেষত নির্বাচনসমূহ শেষ পর্যন্ত আমাদের স্বৈরাচারী উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের দিকে নিয়ে যায়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অন্তত উদারনৈতিক মনোভাব ও সহিষ্ণুতার সংস্কৃতি গড়ে উঠুক। তাই নজরদারি অপব্যবহার করে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মুক্তবুদ্ধির চর্চার পরিবেশ যেন বিঘ্নিত করা না হয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। অতীতে কোনো কোনো সময় ক্যাম্পাসে ভিন্নমতের শিক্ষককে চরমভাবে লাঞ্ছিত হতে দেখেছি। তাই গোয়েন্দা নজরদারি, বৈধ ও প্রয়োজনীয় পুলিশি কার্যক্রমের বাইরে বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্যই থাকবে না। তবে তার অতিরিক্ত রাজনৈতিক বা কোনো দলীয় নজরদারি এবং নিয়োগ পদোন্নতি, পুরস্কার-তিরস্কারে একদেশদর্শী একচোখা এবং ন্যায়নীতি বিবর্জিত পদক্ষেপ দীর্ঘ মেয়াদে দেশে বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থার বিকাশে ভাল নজির সৃষ্টি করবে না। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শতবর্ষের অভিজ্ঞতা ও ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। তারপরে আছে রাজশাহী, চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীরনগর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েটসহ সরকারি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোর প্রসঙ্গ। দ্বিতীয়সারিতে শাহজালাল, খুলনাসহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসঙ্গ আসতে পারে। বাইরের কোনো হস্তক্ষেপে ও নজরদারি ছাড়াও এসব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তথা শিক্ষকরা মিলে নিজেদেরকে স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য ও বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে নিজেদের ও বিশ্ববিদ্যালয়কে কীভাবে মুক্ত রাখবে যে কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবে এবং যে সক্ষমতা শেখানে রয়েছে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে প্রথমেই একটি ইতিবাচক বিষয়ের উল্লেখ অত্যন্ত জরুরি। তা হচ্ছে, বিগত ২/৩ দশকে এ দেশের উচ্চশিক্ষা গ্রহণে বিদেশযাত্রার একটা হিড়িক ছিল। এখনও আছে তবে তা ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে। ভারতের নিচুমানের কিছু প্রতিষ্ঠানে বহু সংখ্যক বাংলাদেশি ছাত্র-ছাত্রীর গমনাগমনের একটা হিড়িক ছিল। কেউ যদি ভারতের আই আই টি, জে এন ইউ, দিল্লি প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয় তাতে দোষের কিছু নেই। এটি অবশ্যই গর্বের। কিন্তু ভারতের অখ্যাত নামসর্বস্ব অনেক প্রতিষ্ঠানে হাজারে হাজারে ছাত্রছাত্রী এ সময় যেতো। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কমবেশি এক লাখ ছাত্রছাত্রীকে স্থান দেয়া সম্ভব হওয়ায় সে হিড়িক কমেছে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ পরিচালনায় অস্বচ্ছতার প্রশ্নটি অনেক পুরনো। এমনও বিশ্ববিদ্যালয় আছে যার উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ সবাই একই পরিবারের। এটিকে একটি পারিবারিক ব্যবসা উদ্যোগ হিসাবে পরিচালনা করা হচ্ছে। কোথাও কোথাও সনদ বিক্রি হয়ে বলে শোনা গেছে। উচ্চহারে বেতন ও ফি আদায় করা হলেও গুণ ও মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ করা হয় না। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্ট-টাইমার দিয়ে ক্লাস চালানো হয়। এ রকমের বহু অভিযোগ আছে। তবে এসবের মধ্যে ৮/১০টি বিশ্ববিদ্যালয় তাদের পরিচালনা কাঠামো, শিক্ষার গুণমান ইত্যাদিতে সত্যিই উপকর্ষতার স্বাক্ষর রেখেছে। তাই নজরদারির প্রশ্ন যখন আসছে তখন শুধু জঙ্গি কর্মকাণ্ড নয়, বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থার সার্বিক উৎকর্ষতার জন্যই নজরদারি, নির্দেশনা, পরামর্শ, ও আইনগত পদক্ষেপ প্রয়োজন। আইন ভঙ্গকারীও নির্দিষ্টমান অর্জনে ব্যর্থ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরই সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের নজরদারি প্রয়োজন। স্বল্পায়ু এ জঙ্গি তৎপরতা একদিন শেষ হয়ে যাবে কিন্তু উচ্চশিক্ষার গুণ ও মান অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও নজরদারি অব্যাহত রাখতে হবে। এটি দেশে উচ্চশিক্ষার ধারার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন।

● লেখক : সমাজবিজ্ঞানী ও স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ
E-mail : tofeil 101@gmail. com